ঐক্য সংগ্রাম প্রগতি

কেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট করব

রাস্তা দিয়ে চলার পথে আমরা অসংখ্য অসহায় মানুষকে দেখি। তারা কেউ রিকশা চালায়, প্রবল রোদের মাঝে ঘামতে ঘামতে মুটে বয়, মজুর খাটে। এমন অনেক ছেলেমেয়েকে আমরা দেখি যাদের স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কথা; অথচ তারা গ্যারেজে, কলে-কারখানায়, মানুষের বাড়িতে কাজ করে। এদের শৈশব নেই, এদের কৈশোর নেই। এরা জানেনা ভালবাসা কী, বন্ধুত্ব কী, বড় হওয়া কাকে বলে, কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়। এদের জীবনে মায়ের স্নেহ আসেনি, বাবার ভালবাসা জোটেনি। হাঁটতে শেখার পর থেকেই তারা কঠিন জীবন সংগ্রামে জড়িয়ে গেছে।

আরেকদল কিশোর-যুবক আছে যারা হয়তো কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগটুকু পেয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনই সেখানে টিকে থাকার সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে তাকে। সে সারাদিন টিউশনি করে, কিংবা ক্লাস শেষ করে একটা পার্ট টাইম চাকরি করে লেখাপড়া চালায়। বছর বছর বেতন ফি, ভর্তি ফি বৃদ্ধির খবরে সে শঙ্কিত হয়। টিউশনি না থাকলে, রোজগারের কোন উপায় না থাকলে সে অসহায় হয়ে পড়ে। তাকে হন্যে হয়ে বন্ধুদের কাছে, সিনিয়রদের কাছে ধর্ণা দিতে হয় একটা টিউশনির জন্য। এদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের নিজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়েও বাড়িতে টাকা পাঠায়, না হলে বাড়ি চলে না। সেটা দিয়ে ছোট ভাইবোনের লেখাপড়া চলে, কখনও মায়ের ওষুধ কেনা হয়, কখনও বাবার ঋণের কিস্তির টাকা শোধ হয়। আর্থিক সংকট প্রবল হলে তাকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে যাহোক একটা কাজে ঢুকতে হয়। জীবনের ডাক তখন তাকে তার স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়।

আমরা যারা স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি– তাদেরকে কি এই ঘটনাগুলো ভাবায় না? নিশ্চয়ই ভাবায়, কারণ ঘটনাগুলো তো আমাদেরই, আমাদের চারপাশেরই। তখন একটা প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে। এইদেশের স্বাধীনতার জন্য কাতারে কাতারে ছাত্রযুবকরা যখন প্রাণ দিয়েছে তখন তাদের চোখেমুখে এক নতুন দেশের স্বপ্ন ছিল। তারা ভেবেছিল বিজয়ের পর দেশটা তাদের হবে। বৈষম্য থাকবেনা, সকলে ন্যায়বিচার পাবে, শিক্ষার অধিকার হবে সকলের। স্বাধীনতার বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। এখনো এতো লোক না খেয়ে আছে কেন? এতো ছেলেমেয়ে পড়তে পারছেনা কেন? কেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এতো ব্যয়বহুল? যতই দিন যাচ্ছে ততই শিক্ষা কেন গুটিকয়েক পয়সাওয়ালা লোকের হাতে বন্দী হয়ে যাচ্ছে? ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকারের আমলে শরীফ কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল এক অভূতপূর্ব ছাত্রআন্দোলন। ইতিহাসে যা '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন নামে বিখ্যাত। সেখানেই ছাত্রসমাজ জানিয়ে দিয়েছিল 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতি চলবেনা। শিক্ষা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক ও মানবিক অধিকার। আমরা বইয়ে পড়ি 'বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান'– সে দেশ ও সমাজের জন্য একটা বোঝা। সেকারণে রাষ্ট্রকেই তার প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, জনগণকে জনসম্পদ করে তুলতে হয়। শিক্ষা ছাড়া কোন মানুষ নৈতিকতাসম্পন্ন, মানবিকতাসম্পন্ন ও দক্ষতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। তাই তখন দাবি উঠেছিল 'শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে'।

অথচ স্বাধীন দেশের চিত্র কী তা আমরা শুরুতেই দেখলাম। সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা ছিল রাষ্ট্রের, রাষ্ট্র তা না করে শিক্ষাখাতকে ব্যবসা করার জন্য উন্মুক্ত করেছে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা এখন ব্যবসার পণ্য। বেতন ফি বছর বছর বাড়ছে, একের পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট কোর্স, উইকএন্ড কোর্স চালু করা হচ্ছে। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগুলো পর্যন্ত ভাড়া দেয়া হচ্ছে। ভর্তি ফি, হল ফি, ডাইনিং ফি সবকিছু বাড়ছে যা শিক্ষার অধিকার যে মৌলিক ও মানবিক তাকেই অস্বীকার করে।

এদেশে আজ শুধু শিক্ষাই নয়, চিকিৎসাসহ সকল পরিষেবাই বাজারের পণ্য। ন্যাশনাল-মাল্টিন্যাশনাল পুঁজিপতিরাই দেশটা চালাচ্ছে, তাদের লোভের হাত থেকে কোনকিছুই রেহাই পাচ্ছে না। গাছের ছায়া, নদীর জল, সুশীতল বায়ু সবকিছুর উপরেই পড়েছে মুনাফার করাল থাবা। মুনাফাভিত্তিক এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে নিয়ে এসেছে 'One time use' কিংবা 'Use and throw' সংস্কৃতি। আমাদের সে শেখাচ্ছে- এক জিনিস বেশিদিন ভাল লাগেনা, ফলে ওয়ান টাইম জিনিস ব্যবহারের অভ্যাস বাড়াও, একবার ব্যবহার করে ফেলে দাও। শেখাচ্ছে- টেকসই নয়, নতুন ও ঝকমকে জিনিস কিনতে হবে। শেখাচ্ছে- মানুষে মানুষে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলে কিছু নেই, কিছু দিলে কিছু পেতে হয়। ফলে সমাজে এসেছে 'Give and take' মানসিকতা। মুনাফা যে সমাজের সকল অর্থনৈতিক উৎপাদনের ভিত্তি সে সমাজে প্রতিটি মানুষ লাভের চিন্তা করবে এটাই স্বাভাবিক। এই লাভের চিন্তা মানুষকে পাগলের মতো ছোটাচ্ছে; ভুলিয়ে দিচ্ছে স্নেহ, আবেগ , ভালবাসাকে; তার সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে। এর বিরুদ্ধে লড়বে যারা সেই ছাত্রযুবকদের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে নেশার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে, মোবাইল-ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে পর্নোগ্রাফি। ফলে একটা প্রজন্ম গড়ে উঠছে শেকড়বিহীন, বিকারহীন, প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে।

প্রশ্ন আসে এই চিত্রই কি চিরন্তন? এসব কি আমরা দেখেই যাব? লাখো মানুষের রক্তে অর্জিত দেশ কি এভাবেই চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে? না কি একে পাল্টানো যায়? মানুষের ইতিহাস 'এখানেই শেষ' বলে কোন পর্দা কখনও টানেনি। আজ চারিদিকে মূল্যবোধের সংকট, নীতি-নৈতিকতার সংকট, রুচির সংকট। অথচ এই নীতির বলে বলীয়ান হয়েই এদেশের ছাত্রসমাজ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের গৌরবের মালা গলায় জড়িয়েছিল। সশস্ত্র রাষ্টের সামনে ন্যায় সত্য ও মূল্যবোধ ছাড়া তো তাদের কোন হাতিয়ার ছিল না। এদেশের ছাত্রসমাজ এ জাতির বিবেক। ছাত্রদের সমস্যা-সংকটই শুধু নয়, দেশের যে কোন সংকটে তারাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তারা আগে জেগেছে, এগিয়ে গেছে, প্রাণ দিয়েছে, তারপর গোটা জাতি জেগেছে।

সেই জাগ্রত ছাত্রসমাজের সংগ্রামের ধারাবাহিকতা বহন করছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। ১৯৮৪ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ থেকে জন্ম

নিয়ে আজ পর্যন্ত সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক, একইধারার শিক্ষার দাবিতে সে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র পরীক্ষা হলের দাবি ছাত্র ফ্রন্ট লড়াই করে আদায় করেছে। ব্র্যাকের হাতে প্রাথমিক স্কুল তুলে দেবার বিরুদ্ধে ছাত্র ফ্রন্টই প্রথম দেশব্যাপী জনমত গড়ে তুলেছে। ইউজিসি'র বিশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্রর বিরুদ্ধে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে লড়ছে এই সংগঠন। ছাত্রস্বার্থবিরোধী সকল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছাত্র ফ্রন্ট সকল সময়ে সোচ্চার ছিল, আজও আছে।

ছাত্র ফ্রন্ট আপনাদের সেই লড়াইয়ে আহবান করছে। আমাদের চলার পথের শক্তি সেই মহৎ মানুষেরা, যারা মানবজাতির জন্য লড়াই করে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, মওলানা ভাসানী, শামসুজ্জোহা, শহিদ রুমীসহ সকল শহিদ ও বড় চরিত্রকে ছাত্র ফ্রন্ট স্মরণ করে, তাঁদের জীবনী চর্চা করে। ছাত্র ফ্রন্ট মনে করে অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রবল আক্রমণে ক্রমশ নিচে নেমে যাওয়া সমাজে কেবলমাত্র সচেতনতাই ক্ষয় আটকাতে পারে না, পাল্টা সংস্কৃতির চর্চা দরকার। বড়লোকদের সমাজ ভেঙ্গে বড় মানুষদের সমাজ গড়া দরকার। তাই ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য হয়ে শুধু শিক্ষার অধিকারের লড়াই নয়, উন্নত চরিত্র গঠনের

আমাদের সাত দফা:

১. তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল নয়, পিইসি-জেএসি পরীক্ষা বাতিল ও প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ কর।

২. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে।

৩. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের সংকট নিরসনে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণ ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে বছরে ২১০দিন ক্লাস চালু কর। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দাও।

৪. ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজের সংকট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য নিজস্ব পরিবহন সুবিধা ও গণ পরিবহনে হাফ ভাড়া নিশ্চিত কর।

৫. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত ফি বৃদ্ধি বন্ধ কর। বাণিজ্যিক নাইট কোর্স ও ইউজিসির কৌশলপত্র বাতিল কর। শিক্ষা-গবেষণা ও ছাত্র অধিকারে বরাদ্দ বৃদ্ধি কর।

৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যমূলক গ্রেডিং পদ্ধতি বাতিল কর। বছর বছর সেমিস্টার ফি বৃদ্ধি বন্ধ কর ও অভিন্ন টিউশন ফি নীতিমালা প্রণয়ন কর।

৭. শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও বেতন কাঠামো নিশ্চিত কর। উচ্চশিক্ষা কমিশন বাতিল করে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ণবিরোধী সেল কার্যকর কর।

২২/১ তোপখানা রোড(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন : ০১৬৮০১৭৯৭৯৪, ০১৯১২৬৬৮৩৩৮